LACTURE NOTE FOR SEM -2 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-18-4-2020

PAPER-CC-4

TOPIC-SREEMADBHAGABADGITA

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত অবতারতত্ত্ব

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস রচিত 'মহাভারতে'র ভীষ্ম পর্বের ২৫-৪২ এই ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। এই গ্রন্থের ১৮টি অধ্যায়ের মধ্যে 'জ্ঞানযোগ' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে ৫নং শ্লোকে থেকে ৮ নং শ্লোক এই চারটি শ্লোকে অবতারতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

অবতার শব্দের অর্থ- অব পূর্বক তৃ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়(অব-তৃ+ঘঞ্) করে 'অবতার' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হল--অবতরণ করা বা উপর থেকে নীচে আসা। ভগবানের উর্ধ্বলোক থেকে অধঃলোকে মানব বা মানবেতর রূপে অবতরণকেই অবতার বলা হয়ে থাকে। এই অবতারতত্ত্ব পুরাণের প্রধান প্রধান বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। অবতার তত্ত্ব ভগবানের ধর্মনিয়ামক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবতার তত্ত্বের বীজ বৈদিক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে নিহিত আছে। 'শ্রীমদ্ভাগবদ্পুরাণ' অনুসারে ভগবানের প্রথম অবতার পুরুষ, যার বর্ণনা ঋগ্বেদের 'পুরুষ সূক্তে' করা হয়েছে। ড. আর. জি ভান্ডারকারের মতানুসারে 'অবতারের' অর্থ 'অবতরন হওয়া'। এর অর্থ হল- কোনো দৈবী শক্তি বা ভগবানের দেবলোক থেকে ভূলোকে অবতরণ। 'অবতার' শব্দের ব্যাখ্যা পুরাণ, বৈদিক গ্রন্থ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়। অবতারবাদের ব্যাখ্যা সবথেকে বিস্তারিতভাবে 'শ্রীমদ্ভভগবদ্গীতা'য় মেলে।

অবতার মুখ্যরূপে তিনপ্রকার। যথা-১। পূর্ণাবতার, ২। আবেশাবতার, ৩। অংশাবতার। আবার, রূপ অনুসারে অবতারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা----

১। পশু অবতার--মৎস, কূর্ম ও বরাহ।

২।মানবীয় অবতার-বামন, রাম(দাশরথী), রাম(ভার্গব), কৃষ্ণ-বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি।

ও ৩। মিশ্রিত অবতার-- নৃসিংহ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত অবতারতত্ত্ব--শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'জ্ঞানযোগ' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান্ কর্মযোগের পরম্পরা জানিয়ে তৃতীয় শ্লোকে তার প্রশংসা করেছেন। চতুর্থ শ্লোকে অজুন ভগবানের কাছে জন্মবিষয়ক প্রশ্ন করেছেন, পঞ্চম শ্লোকে ভগবান নিজের ও অজুনের বহু জন্ম হওয়ার কথা বলে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে নিজ অবতারতত্ত্বের রহস্য, তত্ত্ব , সময় ও নিমিত্তের বর্ণনা করেছেন।

যোগধর্মের প্রাচীন পরম্পরা বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন--তিনি এই অবিনাশী যোগ সূর্যকে বলেছিলেন, সূর্য তাঁর পুত্র মনুকে, মনু তাঁর

পুত্র রাজা ইক্ষাকুকে বলেছিলেন। উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে মানুষের মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন হতে পারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো এই দ্বাপর যুগে প্রকটিত হয়েছেন আর সূর্যদেব, মনু, ইক্ষাকু তো বহু আগেই প্রকট হয়েছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ কী করে এই যোগের উপদেশ সূর্যকে দিয়েছিলেন ? তাই এর সমাধানের সঙ্গেই ভগবানের অবতারতত্ত্ব ভালোভাবে বোঝার জন্য অজুন জিজ্ঞাসা করলেন--

''অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।''

অজুনের এরূপ জিজ্ঞাসায় ভগবান তাঁর অবতার তত্ত্বের রহস্য বোঝাবার জন্য নিজের সর্বজ্ঞতা প্রকট করে বলেছেন---

''বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জন,
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।''

এই শ্লোকের অর্থ হল-- হে পরন্তপ অজুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম হয়েছে। সেসব তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি।

এর ভাবার্থ হল--অজুন ও শ্রীকৃষ্ণ যে আগে ছিলেন না ; এখনি জন্মেছেন এমন নয়, তাঁরা অনাদি ও নিত্য। ভগবানের নিত্য স্বরূপ তো আছেই এছাড়া তিনি মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ , বামন প্রভৃতি নানা রূপে আগে প্রকটিত হয়েছেন। আবার, **''তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ''** এই শ্লোকাংশের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সর্বজ্ঞতা এবং জীবেদের অল্পজ্ঞতার দিক নির্দেশ করিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ দেহ ধারণ করলেও তিনি অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বশ নন। সুতরাং তাঁর সর্বজ্ঞতা লুপ্ত হয় না। কিন্তু অজুন অবিদ্যা দ্বারা আবৃত, অজ্ঞান দ্বারা তাঁর জ্ঞানসূত্র ছিন্ন, তাই তিনি (অজুন) পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে না। এই কথা বলার পর ভগবান অজুনকে তাঁর জন্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেছেন---

'' অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাত্মমায়য়া।।''

এর অর্থ হল-তিনি জন্মরহিত, অবিনাশীস্বরূপ এবং সর্বপ্রাণীর ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে নিজ যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত হন। তিনি জন্ম-মৃত্যুরহিত সর্বভূতেশ্বর, অতএব ধর্মাধর্মের অনধীন, সুতরাং প্রাণীগণের যেরূপ জন্ম-মৃত্যু হয় তাঁর আবির্ভাব সেরূপে হয় না। তাঁর আবির্ভাব কীরূপে হয় তা বোঝানোর জন্য তিনি বলেছেন--**''স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি''**। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এর অর্থ করেছেন--**''আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া অর্থাৎ উহার স্বাতন্ত্র্য নিরাকৃত করিয়া আমার ইচ্ছার অধীন করিয়া মায়াবলে আবীর্ভূত হই অর্থাৎ যেন**

দেহবিশিষ্ট হই।'' অবশ্য যাঁরা অবতারবাদ স্বীকার করেন না তাঁরা এ সম্বন্ধে নানা তর্ক করে থাকেন। যেমন, অনন্ত ঈশব্ব স্বান্ত হবেন কীরূপে ? যিনি নিরাকার তিনি সাকার হবেন কীরূপে ? এইসকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হল এই যে, যিনি সর্বশক্তিমান তাঁতে সকলই সম্ভব--**''তাদৃশঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিদ্ধেৎ পরমেশতা''**-এটা স্বীকার না করলে পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করা হবে।

এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হবে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন-- **''আমি অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করি, অকর্তা হইয়াও কর্ম করি , অব্যক্ত ইইয়াও ব্যক্ত রূপ ধারণ করি।''** বস্তুতঃ যারা ঈশ্বর তত্ত্ব বলতে এমন বস্তু বোঝেন যিনি বিশ্বের উপরে, জীবজগতের বাইরে , যিনি কেবল সৃষ্টিকর্তা, পার্থিব রাজার মত জগতের শাসনকর্তা, তাঁদের নিকট অবতারবাদ অসম্ভব বলেই বোধ হয়। তাঁদের মতে সৃষ্টিকর্তা কখনও সৃষ্ট জীবরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারেন না। যিনি ঈশ্বর তিনি কখনও মানবীয় কর্ম্মের মধ্যে , মানবীয় শরীরের মধ্যে বদ্ধ হতে পারেন না। কিন্তু বেদান্তবাদী হিন্দু ঈশ্বরতত্ত্ব সেরূপভাবে বোঝেন না। বেদান্ত মতে ঈশ্বর কেবল এক নন। তিনি অদ্বিতীয়, তিনিই সমস্ত, তিনি জগদ্রূপে পরিণত। সুতরাং অজ আত্মার দেহ সম্পর্ক গ্রহণ করা তো অসম্ভব নয়ই, বরং সেই সম্পর্কেই জগতের অস্তিত্ব। কাজেই হিন্দুর পক্ষে অবতারবাদ কেবল ভক্তিবিশ্বাসের বিষয়মাত্র নয়, তা বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

<u>শ্রীকৃষ্ণ অবতারের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য--</u>

ভগবানের মুখ থেকে এইভাবে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনে অজুন তাঁর কাছ থেকে তাঁর অবতাররূপ ধারণের কারণ ও সময় জানতে চাইলে ভগবান বলেছেন---

'' যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।''

ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণের নির্দিষ্ট কোনো নিশ্চিত সময় নেই, ধর্মের হ্রাস ও অধর্মের বৃদ্ধির ফলে যখন যে সময় ভগবান তাঁর প্রকট হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তখন ই প্রকটিত হন। তবে কীরূপ ধর্মহানি ও পাপ বৃদ্ধি হলে ভগবান অবতাররূপ গ্রহণ কেন তা বাস্তবে ভগবানই জানেন। তবে অনুমানে বলা যায় যে যখন ঋষিকল্প, ধার্মিক, ঈশ্বরপ্রেমী, সদাচারী পুরুষ এবং নিরপরাধ, দুর্বল প্রাণিদের ওপর বলবান ও দুরাচারী মানুষদের অত্যাচার বৃদ্ধি পায় এবং লোকেদের মধ্যে সদাচার ও সদ্‌গুণ হ্রাস পেয়ে দুরগুণ দুরাচার ছড়িয়ে পড়ে তখনই ভগবান অবতাররূপে অবতীর্ণ হন।

এরপর ভগবান তাঁর অবতাররূপ ধারণের উদ্দেশ্য ও কার্য বলতে গিয়ে বলেছেন-----

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

এই শ্লোকে দেখা যাচ্ছে , ভগবানের অবতাররূপ ধারণের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে-**১। সাধুদিগের পরিত্রাণ-পরিত্রাণায় সাধূনাং, ২। দুষ্কৃতিদিগের বিনাশ-বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ৩। ধর্মসংস্থাপন-ধর্মসংস্থাপনার্থায়।**

১।পরিত্রাণায় সাধূনাং-- যে ব্যক্তি অহিংসা, সত্য , অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি সমস্ত ধর্মের এবং যজ্ঞ, দানাদি নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম ঠিকমত পালন করেন, অপরের মঙ্গল করাই যাঁর স্বভাব---সেই সব মানুষদের বাচক এখানে 'সাধু' শব্দটি। এরূপ ব্যক্তিদের উপর যেসব দুষ্ট দুরাচারীরা ভীষণ অত্যাচার করে -সেই অত্যাচারীদের কবল থেকে এই সাধু ব্যক্তিদের মুক্ত করতে ভগবান অবতার রূপ ধারণ করেন।

২। বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্- এখানে যে ব্যক্তি নিরাপরাধ, সদাচারী ও ভগবানের ভক্তদের উপর অত্যাচার করে , যে ব্যক্তি ভগবান এবং বেদ শাস্ত্রাদির বিরোধ করাই যার স্বভাব-এরূপ আসুরী স্বভাব সম্পন্ন দুষ্টব্যক্তিদের বাচক হল 'দুষ্কৃতাম্' পদটি। এরূপ দুষ্ট প্রকৃতির দুরাচারী মানুষদের কুস্বভাব থেকে মুক্ত করার জন্য ভগবান অবতার রূপ ধারণ করেন।

৩। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়---ধর্মসংস্থাপন বলতে নিজে শাস্ত্রানুকুল আচরণ করে, বিভিন্ন প্রকারে ধর্মের মাহাত্ম্য দেখিয়ে এবং লোকেদের মর্মস্পর্শী অপ্রতিম প্রভাবশালী বাক্যের দ্বারা উপদেশ-আদেশ দিয়ে সকলের অন্তরে বেদ, শাস্ত্র পরলোক, মহাপুরুষ ও ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করানো এবং সদ্‌গুণ, সদাচারে বিশ্বাস ও ভালোবাসা উৎপন্ন করে লোকেদের এই সবে দৃঢ়তাপূর্ণ ধারণ করানো ইত্যাদি সবই ধর্মসংস্থাপনার অন্তর্গত। এই ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান অবতাররূপ ধারণ করেন।

দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভারতে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছিল। সর্বত্র অধর্ম রাজত্ব করেছিল। সে সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন, তাতে বোঝা যায় ধর্মদ্রোহী দুবৃত্তগণের অত্যাচারে দেশে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল। ধর্মরাজ রাজসূয় যজ্ঞের কর্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ চাইলে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন--আপনার সাম্রাজ্য লাভে অধিকার আছে সত্য, কিন্তু রাজন্যবর্গের উপর আপনার আধীপত্য নেই। সেই আধীপত্য আছে জরাসন্ধের , জরাসন্ধই এখন প্রকৃতপক্ষে ভারতের সম্রাট। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই জরাসন্ধ একশত রাজাকে বলিদান পূর্বক এক পাশবিক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ৮৬ জন রাজাকে ধৃত ও শৃঙ্খলিত করে রেখেছিলেন। তাঁর ভয়ে দক্ষিণ পাঞ্চাল, পূর্ব কোশল , শূরসেন প্রভৃতি দেশের রাজগণ সকলেই পালিয়ে গিয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশে আশ্রয় নিয়েছেলেন। পশ্চিম

ভারতে এই জরাসন্ধের জামাতা কংস পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করে মথুরার সিংহাসন অধীকার করেছিলেন এবং জ্ঞাতিগণের উপর নিদারূণ অত্যাচার আরম্ভ করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে চেদীরাজ শিশুপাল জরাসন্ধের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। পূর্বাঞ্চলের কামরূপের রাজা নরক, শোণিতপুরের রাজা বাসুদেব-এঁরা সকলেই জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন।

সমগ্র ভারতে একত্ব স্থাপনের চেষ্টা, অসপত্ন সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস চিরকালই ভারতে শক্তিশালী রাজগণের পুণ্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রধানত এই প্রাচীন প্রথার অনুবর্তন করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়ে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুযোধনের সাম্রাজ্যশ্রী তাঁর জ্ঞাতিগণের অসহ্য হল। প্রবল মিত্রপক্ষের সহায়তা লাভ করে দুযোধন দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন এই মদদৃপ্ত ক্ষত্রিয়কূল নির্মূল না হলে ভারতে ধর্ম ও শান্তিস্থাপন সম্বভপর হবে না। তাই তিনি এই উদ্দাম ক্ষাত্রতেজ বিধ্বস্ত করতে কৃতসংকল্প হলেন। ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-যুদ্ধের ফল নিষ্কন্টক ধর্মরাজ্য স্থাপন।

ধর্মের দুটি দিক একটি বাহ্য বা ব্যবহারিক ও অপরটি আভ্যন্তরিণ বা আধ্যাত্মিক। **শ্রীকৃষ্ণ অবতারেরও দুটি দিক-একটি অন্তর্জগতে মানবাত্মার উন্নতি সাধন অপরটি বাহ্য জগতে মানব সমাজের রাষ্ট্রীয় বা নৈতিক পরিবর্তনসাধন।** কিন্তু কেবল এটাই অবতারের উদ্দেশ্য নয়। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতিকেও অবতার বলা হয়। কিন্তু এসকল অবতারের অসুর বিনাশ নেই, এসকল অবতারের একমাত্র উদ্দেশ্য মানবাত্মাকে দিব্য প্রেম পবিত্রতা জ্ঞান শক্তির অনুপ্রেরণা দেওয়া। পক্ষান্তরে পৌরাণিক নৃসিংহাদি অবতারের অসুর বিনাশ ছাড়া আর কিছু প্রয়োজন দেখা যায় না। **কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতারের দুটো দিকই আছে। বাহ্যতঃ দুষ্কৃতিদিগের বিনাশ করে সাধুদিগের সংরক্ষণ ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপন , দ্বিতীয়তঃ, মানবকে দিব্য কর্মে আদর্শ দেখিয়ে দিব্য জীবনের অধিকারী করা।**

এইভাবে ভগবান তাঁর দিব্য জন্মের সময়, হেতু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

.....